# বিস্মৃতির আকাশের তারা : কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য

অমিতাভ বটব্যাল

১৯৩৫ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে তারিখবিহীন একটি পত্রে লিখেছিলেন, "আমি যতদূর জানি আধুনিক বাঙ্‌লা কবিদের মধ্যে প্রকৃত গীতিকবিতা লেখেন কেবল আপনি।" আমাদের মনে রাখতে হবে সঞ্জয় ভট্টাচার্যর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাগর ও অন্যান্য কবিতা*-র প্রকাশকাল ১৯৩৭।

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের অতি প্রিয় দুটি শব্দ—'জ্যোৎস্না' ও 'উর্ব্বশী'। সমগ্র কাব্যজীবনে এধরনের শব্দ ব্যবহারের তবু কিছুটা পর্যায়ক্রম ছিল। কিন্তু 'আকাশ', এই ব্যপ্তিমান শব্দটিকে শেষদিন পর্যন্ত কবি লালন করেছেন পরম যত্নে, যন্ত্রণায়, হতাশায় ও ভালোবাসায়।

> কতদিন/জলের ক্লান্ত নিঃশ্বাস/মেঘ হয়ে উঠেছে আকাশে
> আর এক দিন/সে-মেঘ গেল স্বপ্ন হয়ে/পৃথিবীর আকাশ-ভরা নীল ঘুমে।
> (*আকস্মিক, ১৯৩৫*)

এই সময়ের গীতিকবিতাগুলি অনেকটা স্বপ্নালু বিশুদ্ধতায় ভরা; একটি স্থির বিষয়ের দিকে একজন আত্মমগ্ন দক্ষ শব্দশিল্পীর যে কাব্য-রচনার অভীপ্সা, তা তখনও সার্থকভাবে করায়ত্ত নয়। কিন্তু মানবের স্বভূমি, স্বপ্ন এবং সর্বোপরি দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বিশ্ব-রাজনীতির অভিজ্ঞান তখন সঞ্জয়কে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বহুকৌণিক বিস্তার-পথে তাড়িত করছিলো।

আসন্ন বিশ্বযুদ্ধকালীন অস্থিরতা এবং আধুনিক সমাজ-চেতনার আবেগ তাঁর কবিতাকে বিপর্যস্ত করেছে—'আমরা পাই নি এসে পৃথিবীর প্রথম যৌবন/আকাশে হারিয়ে গেছে কত কথা তরুণ তারার—'। অথবা, 'আর ফুলের গন্ধ নয়, পৃথিবী/ভালো লাগে এবার/ঘামের গন্ধ—'। পরম অভিমানে তখন উচ্চারণ করছেন কবি,—'নিয়ে যাও তোমার আকাশ, দেবতা'। আবার নতুন অচেনা আকাশের প্রতি, 'এ আকাশ কি আমরা চিনি?/আমরা মরেছি বহুদিন।'

এই সময় কবির *পৃথিবী* এবং *সংকলিতা* কাব্যগ্রন্থ দুটির প্রকাশ যথাক্রমে ১৯৩৯ এবং ১৯৪২-এ। এরপর যুদ্ধোত্তর স্মৃতি নিয়ে *নতুন দিন* (১৯৪৭), *প্রাচীন প্রাচী* (১৯৪৮) এবং *যৌবনোত্তর* (১৯৪৮) কাব্যত্রয়ীর প্রথমোক্ত কাব্যটির '১৯৪২-এর পর' কবিতাটিতে দেখি : 'রক্তের ফোঁটায় সেই অন্ধকার—রাত্রির আকাশ', অথবা *প্রাচীন প্রাচী*-র 'ভারতবর্ষ' কবিতাটিতে—

> তবু কতটুকু দিতে পারে আকাশ মাটির মানুষকে?
> দিতে পারে স্বপ্ন, রক্ত নয়—
> দিতে পারে মৃত্যুর কাহিনী, জীবনের স্পন্দন নয়।

প্রকৃতপক্ষে সঞ্জয় ভট্টাচার্যর প্রতি বিস্মরণ-স্খলনের দায়বদ্ধতায় আমরা তাঁর পুরাতত্ত্ব, ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা এবং সমকালিক চেতনা-সমন্বিত পঙ্‌ক্তিগুলি অনায়াসেই সরিয়ে রাখতে পারি। কিন্তু বাঙালি তাঁর গীতিকবিতার হৃদয়গত মূর্চ্ছনা ও অন্তহীন আকাশযাত্রা ভুলে যেতে

বসেছে। সঞ্জয়কে বিস্মৃত হয়ে বাউন্ডুলে বখাটে ছেলের মতো আমরা সাহিত্যের এই বিপুল অপচয়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি, এটাকে কি কিছুতেই ঠেকানো যেত না, প্রশ্নটা সেখানেই!

কাদম্বরীর কালজয়ী প্রভাব রবীন্দ্রনাথের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যকেও অশেষ ঋদ্ধ করে তুলেছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যর জীবনে তেমনই একটি অকালপ্রয়াণের বিরহ-বেদনা এসে থাকলেও, তা সর্বজনব্যাপ্ত স্তন্তন সৃষ্টি করেনি ঠিকই, কিন্তু কবির একান্ত মনোজগতের দিগন্তব্যাপী আকাশে ঘটনাটি যে কান্না-হাসির রঙ পাল্টেছে জীবন ব্যাপ্ত করে; আর সেই অনাস্বাদিত স্বর্ণ-খণ্ডগুলির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হলো কবির আত্মহননের আকাঙ্ক্ষা ও মনোবিকারের দীর্ঘ পর্যায় পর্যন্ত। বৈষ্ণব পদাবলীর পদাঙ্ক অনুসরণে আমরা লক্ষ্য করি ব্যক্তি-প্রেমের অপার প্রাপ্তির বা বিপুল সম্ভাবনার পরেও এক শূন্যতাবোধ বা নিঃসঙ্গতা মানবজীবনকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত না করে এমন এক শৈল্পিক অনুভবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, যা একটি সর্বজনীন মহতী সৃষ্টির বীজ বপনে সহায়ক হয়ে ওঠে—

তোমার চোখের কাছে এমন সহজে হেরে যাই।
দুয়ার পাইনে খুঁজে তাই বুঝি বার-বার আকাশে তাকাই।

*(বিরহমিলন-গাঁথা, পদাবলী)*

সঞ্জয় ভট্টাচার্যর আজীবন সুহৃদ ও সহচর সত্যপ্রসন্ন দত্তর কনিষ্ঠা ভগিনী অনিমা দত্ত বা বেলার প্রয়াণ ঘটে ১৯৪৩-এ মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯—এই সময়কালের মধ্যে লিখিত সঞ্জয়ের দিনলিপির পৃষ্ঠাগুলি লক্ষ্য করলেই বেলার অকালমৃত্যুর অভিঘাতটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

তৃতীয় মৃত্যুতিথি আজ বেলার। তিন বছর হয়ে গেল, ও নেই। কিন্তু আমি আছি। কিন্তু থাকবার কোনো মানে পাইনে। *(১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬)*

'কল্লোল' উপন্যাসটি সমাপ্ত করে ১৯৪৭-এর ৩০ মে লিখছেন, "বেলাকে মনে পড়ছে আজ। আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ও পড়তো।"

১৯৪৮-এর ১৪ এপ্রিল (১ বৈশাখ) লিখলেন, "হয়তো ৩৯ বছর বয়স আমার—বুড়ো হবার কথা নয়। তবু বার্ধক্য এসেছে। ...বেলার কথাও মনে পড়ছে।... একটা ফিকে ব্যথা হয়ে সমস্ত মনে ছড়িয়ে আছে বেলা। তাই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।" আরেকটি দিনলিপি :

ঘুম ভেঙে গেছে চারটায়। নিঃসঙ্গ জীবনের রূঢ় হাত যেন চেপে ধরেছে আমায়। কয়েক মাস ধরেই। প্রেমহীন জীবন। ঘুম ভেঙেই বেলাকে মনে পড়লো।

*(ভোর পাঁচটা, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৯)*

১৯৫২ সালে (আশ্বিন ১৩৫৯) প্রকাশিত হলো সঞ্জয় ভট্টাচার্যর 'অপ্রেম ও প্রেম' কাব্যগ্রন্থটি। বাংলা লিরিকের সোনার ফসলগুলি তরীতে বোঝাই হতে শুরু করলো রবীন্দ্র-প্রয়াণের দশ বছর পরে। মোট বারোটি ভাগে বিভক্ত গ্রন্থটির নাম-কবিতাটি শেষ হচ্ছে এইভাবে :

আকাশে ও জলে মুছে যাক ব্যর্থ আমার আরতি
পদচিহ্ন মুছে যাক অন্ধকার সময়ের কূলে।

একটি স্থির স্বজ্ঞা-র প্রতি অনুযাত্রা সঞ্জয়ের পক্ষে প্রায় সবসময়েই যুগের সাথে তাল মেলানোর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনাগত কালেও তাই কাব্য-স্থায়িত্ব নিয়ে কবির এই সংশয় ছিল রচনার স্বর্ণ-পর্বেও। একশো উনআশি পঙ্‌ক্তির এই কবিতায় 'আকাশ' শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে মোট কুড়ি বার। প্রকৃত রসোত্তীর্ণ লিরিকের পক্ষে তথ্যটি বেশ বেমানান। তবু কবিকে মানতেই হয় জীবনের শর্ত—

কত ঝড় এল-যে আকাশে
তবু তো আকাশ দেখে শুনে যাই শুনে যাই হৃদয়ের মৃত্যু বিধু নন?

হৃদয় ও আকাশ এখানে প্রায় অভেদ হয়ে ওঠে সঞ্জয়ের ব্যক্তি-জীবন ও কাব্যানুভূতির মধ্যে। আলোচিত কবিতারই দুটি পঙ্‌ক্তি বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের প্রেম-লিরিকে অমরত্বের বার্তাবহ হয়ে উঠলো।—

হৃদয় আকাশ হয়ে আছে
কোনও এক মৃত প্রেম ভুলে যাই পাছে।

*কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য* *শিল্পী : প্রকাশ দাশ*

জীবনের চলমান সংগ্রাম অনেক সময় কাব্য-উত্তরণের সহায়ক হয়ে উঠলেও সঞ্জয় ভট্টাচার্যর কঠোর শৈল্পিক শৃঙ্খলা তাকে প্রতিহত করেছে বার বার। ১৯৪৩-এ 'পূর্বাশা' পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থার অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের প্রয়াসে যশোর জেলার পাঁচ হাজার বিঘা পতিত জমিতে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্ত তৈরি করেন 'মডেল ফার্ম'। ১৯৪৭-এর পরবর্তী অধ্যায়ে এই জমি হঠাৎ বিদেশি সম্পত্তি হয়ে পড়ে। অপ্রত্যাশিত ভাবে যশোরও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। প্রপার্টি ট্রান্সফারের চেষ্টাও সফল হয়ে উঠলো না। বাঙালি তখন তার জীবনের দুরূহতম ও চিরবহমান সংকটের মুখোমুখি হচ্ছিলো। কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য, পূর্বাশা এবং মডেল ফার্ম—এই তিনটি বিষয় তখন একই সূত্রে দাঁড়িয়ে স্থির বিন্দু থেকে ক্রমশ অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। বৃত্তটি যেন আর সম্পূর্ণ করা যাচ্ছিলো না কিছুতেই। শুধু একটি অর্ধ-বৃত্তাকার আকাশ দিগন্তবলয়ে নিঃশেষিত হতে হতে কোনো একটি কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চাইছিলো প্রবলভাবে—

> আলো বর্ষের আলোবর্ত্মের অবনমিত অমিত জ্যামিতির শেষেও আবার আকাশ।
> আবার স্থান—অসীম উর্ধ্ব, অতল অধঃ, অপস্রিয়মান দিগন্ত।
>
> *(সাংখ্য, পদাবলী, ১৯৪৭)*

১৯৫০-এ তখন 'মডেল ফার্ম' প্রায় ভেঙে পড়েছে। একই সঙ্গে 'কুমিল্লা ব্যাঙ্ক', যা 'পূর্বাশা প্রেস'-কে নিরবিচ্ছিন্ন ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, তারও অস্তিত্ব লোপ পায় 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড' তৈরি হওয়ায়।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যর জীবনের গূঢ় ক্রান্তিকালে কবিতার স্রোত তখন প্রায় স্তব্ধ। কবির চিরসহচর সত্যপ্রসন্ন দত্ত লিখছেন, "১২ই জুলাই, ১৯৫১ বেলা দশটা নাগাদ কাজের খোঁজে বেরিয়েছি, ১২টা নাগাদ বাড়ি ফিরে এসে দেখি রক্ত গঙ্গা। হাতের কব্জির শিরা কেটে অনেকগুলি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। এই সময়েই লেখা অনন্য কবিতাটির (*অপ্রেম ও প্রেম*) কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—

> আমার আকাশ নেই তবু তারে পেতে দাও
> দাও এক কণা।

জীবনের উজ্জ্বলতম সময়েও রবীন্দ্রনাথকে ভাবতে হয়েছে আত্মহননের কথা, এই মুহূর্তে একজন মুক্তি-প্রত্যাশী আবেগতাড়িত কবির কাছে যা অনেকটাই স্বাভাবিক ছিল ক্রমপুঞ্জিত সংকট ও অস্তিত্বহীনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

১৯৫৫-য় একেবারে উঠে গেল 'মডেল ফার্ম'। এটিকে একটি ঠিকাদারী সংস্থায় রূপান্তরিত করেও শেষ রক্ষা করা গেল না। অক্টোবর মাসে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে তীব্র মানসিক ব্যাধির প্রকোপের কারণে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই সময় হাসপাতালে তাঁর সহবাসী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, *পদ্মা নদীর মাঝি* ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় সঞ্জয়-সম্পাদিত 'পূর্বাশা'-তেই।

১৯৫৭ সালে দেনার দায়ে 'পূর্বাশা'-র সমস্ত সম্পত্তি নিলাম হয়ে যায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তখন ব্যারাকপুরে, অগ্রজ বিজয়কুমার ভট্টাচার্যর বাড়িতে। কলকাতার গণেশচন্দ্র অ্যাভিন্যুর বাসাবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হতে হলো সঞ্জয় ও সত্যপ্রসন্নকে। ১৯৩৩-এ যখন জন্মস্থান কুমিল্লা

থেকে চব্বিশ বছর বয়সে চলে এসেছিলেন, তার কিছু পর থেকেই একটানা কাটিয়েছেন এখানেই। তবু কিন্তু শহরের বিশিষ্ট নাগরিক হতে পারেন নি, গড়ে তুলতে পারলেন না কোনও ভক্তকুল। যে পাঠক-মনোরঞ্জন ও কবিখ্যাতির প্রয়াস আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে শহুরে কবিকে, তাও ত্যাগ করেছেন অনায়াসে নির্মোহ সততায় ও অকপট হৃদয়ের লেখন-মুক্তিতে। নাগরিক বাঙালি কাব্য-পাঠক সঞ্জয়কে অতৃপ্তি ও হতাশার কবি বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দিতে পারলো সহজেই; তাই ষাট বছর বয়সে মৃত্যুর কিছু আগেই একটি সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলতে হলো, "আমার শেষ কথা এই : হয় আমি সাহিত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, না-হয় বাঙলা দেশের পাঠক এবং সমালোচকরা সাহিত্য বিষয়ে নেহাত নির্বোধ।" (*সারস্বত পত্রিকা, ১৯৬৮*) তাই একজন কবিকে প্রয়াণের বারো বছর আগেই লিখতে হয়—

ভুল কি-না বলতে কে পারে—
আমি যদি রাখি ফুল আমার প্রাচীন শবাধারে।

*(শারদীয় আনন্দবাজার, স্মরণীয়, ১৯৫৭)*

সঞ্জয় আবার কলকাতায় ফিরলেন ১৯৫৮-য়, কিছুটা আরোগ্যলাভের পর। ঐ বছরই প্রকাশিত হলো দুটি কাব্যগ্রন্থ *সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা* এবং *সবিতা*।

একজন কবির জীবনের এই তথ্যগুলি অনেকটাই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কবির মগ্ন-চৈতন্যের ছাপ পড়ে তার জীবনধারায়। জীবন থেকে উৎসাহিত হয় অপ্রেম ও প্রেমের লিরিক্যাল টানাপোড়েন। 'সবিতা'-র 'মানসীজা' কবিতাটিতে দেখি—

এ কোন যৌবন-স্বপ্ন পঞ্চাশের ঘরে?
ঊনপঞ্চাশের শেষ ঘণ্টা বাজে পাত্রের প্রহরে।

১৯৫৮-র শেষের দিকে কবি আবার ভয়ানক ডিপ্রেশনের গহ্বরে প্রবেশ করেন। এটিই মনে হয় তাঁর মানসিক অবসাদের কঠিনতম পর্ব। খেতে চাইতেন না কিছুই, কথাও বলতেন না কারও সঙ্গে। ব্যারাকপুরে কবিকে দেখাশোনা ক্রমশ জটিল ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। দু-বছর পরে সত্যপ্রসন্ন দত্ত কবিকে অগ্রজ-র বাড়ি থেকে কলকাতার ঢাকুরিয়ায় সেলিমপুরের একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে আসেন এবং আমৃত্যু সেখানেই থেকে যান ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ পর্যন্ত।

সত্যপ্রসন্ন লিখছেন, "ঢাকুরিয়া আসার পর আমৃত্যু সঞ্জয়বাবু মোটামুটি সুস্থ ছিলেন। একটু আধটু Elation মাঝে মাঝে হয়নি তা নয়। তবু খুব বাড়াবাড়ি কিছু হয়নি। Tranquiliser বরাবরই খেতে হতো—এ-সব বেশি খাওয়ার দরুণই ৬০ বছর বয়সে হার্টফেল করেন।"

*উত্তরপঞ্চাশ* কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩-র সেপ্টেম্বরে। আহত এক প্রেমচেতনা কবিকে প্রায়শই তখন বিধ্বস্ত করে তুললেও, চিরায়মান কালচেতনার প্রতি দায়বদ্ধতা ও সততা আমাদের মুগ্ধ করে—

ক্রন্দিত আকাশ যে রৌদ্র স্পন্দনে—আমি-যে
তারই অনুরণন দেখতে পেয়েছি তোমার সত্তায়—

*(রবীন্দ্র জন্মদিনে)*

রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতা যে এরই সাক্ষ্য বহন করে, তা-তো অস্বীকার করা যায় না। সঞ্জয়কে 'পূর্বাশা'-র হিটলার-বিরোধী সংখ্যার জন্য ভোগ করতে হয়েছে অসীম

লাঞ্ছনা। তথাকথিত নব্য-কম্যুনিজম্ তাঁকে আক্রমণ করেছে। স্তালিনবাদের বিপক্ষে ট্রটস্কিবাদের অনুকূলে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল সর্বজনবিদিত। তবুও পরবর্তী সময়ে তিনি যেন কিছুটা গান্ধীবাদের দিকে সরে আসেন—

পাই যেন মনের আকাশে।
সে-আকাশও আর্ত, অন্ধকার,
তবু তা'র আভা আছে সূর্যের আভাসে।

*(গান্ধীজীকে, উত্তর পঞ্চাশ)*

সঞ্জয় ভট্টাচার্যর ইতিহাস-চেতনা ও প্রাচীন তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার তাঁকে প্রজ্ঞাবান ছাপটি মেরে দিয়েছিল। জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর দেড় ঘন্টা আগে রচিত 'জীবনানন্দের মৃত্যু —রাত্রির কবিতা'-য় আমরা তাঁর অনুভবের এই অনন্য পংক্তিগুলি পেয়ে যাই—

একটি জাহাজ ছেড়ে গেল
... ... ... ...
দু'দিনের কাঠ-শ্যাওলার ছোঁয়াটুকু
জেটির মাটিতে গাঁথা মুখ।

তীব্র মনোবিকলনের সময়েও সঞ্জয়ের হস্তাক্ষর ছিল ঋজু ও পরিচ্ছন্ন। কবিতা কখনও ভারসাম্যহীনতায় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে না। পরিপার্শ্বচেতনাহীন এক কবির কলমে লেখা হচ্ছে এইসব পঙ্‌ক্তি—

দু-হাতে ঢেকেছ তুমি স্তন
আমি আছি পিছে,
এ-ছবির উন্মাদনা পাই।
পেতে শুধু এক খণ্ড আকাশের সোনা-চাঁদ চাই *(রোগশয্যায়, উত্তরপঞ্চাশ)*

আমাদের তাই মাঝে মাঝেই মনে হয় ইতিহাস ও সমাজচেতনার দায়বদ্ধতা থেকে সরে এসে কবি যদি একটি স্থির বিন্দুর দিকে অগ্রসর হতেন, সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ে স্ব-সত্তাকে আত্মমগ্ন করতেন শুধুমাত্র লিরিক্যাল ধ্বনিপ্রবাহে, তা হলে তো হৃদয় ও আকাশের চিরকালীন কথা বলা যেত আরও সার্থকভাবে, যার বিস্ময়কর তূণ ছিল তাঁর হাতে। একটি মহৎ কবি-প্রতিভার এত বড় অপচয় বন্ধ হতে পারতো অনায়াসেই।

হৃদয়ের হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস, যা দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ও তার পরবর্তী স্বাধীনতা-লগ্নে দেশভাগের সাঙ্ঘাতিক হু-হুংকারের মধ্যে দিয়ে ভেঙে-চুরে একশেষ হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাঙা টুকরোগুলি সংগ্রহ করে জোড়া লাগানোর কাব্যিক-যজ্ঞে নিজেকে নিমগ্ন করতে পারতেন। সেই মহতী সততা তাঁর সহজাত ছিল, টি.এস.এলিয়ট যাকে প্রকৃতপক্ষে still centre বলেছেন। *উত্তরপঞ্চাশ*-এর 'চারটি নিবেদন ও একটি প্রশ্ন' শীর্ষক কবিতায়, যেখানে বৃত্তটি সম্পূর্ণ করার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষায় 'এলিয়ট'-কে বলছেন—

একটি স্থির বিন্দুতে যেতে চাই আমি।
আকাশ যেখানে এসে মেশে একটি ঘাসের ডগায়
হাওয়ায় নড়ে না যে ঘাস

অতলান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যেও সঞ্জয় বিশ্বাস হারাননি আকাশের প্রতি, যে আকাশ আলো দেয়। 'প্রার্থনা' করছেন—'দাও আলো, দাও কন্যা, আমি আজ মৃত'। 'জীবন'-কে বলছেন—

ভিক্ষুকের মতো আমি চেয়ে থাকি আকাশের দিকে
... ... ... ...
'আমাকে জীবন দাও প্রিয়ে'—
মৃত্যু-দূতী এলে বলি আমি।
দেখি অন্ধকার হতে আলো-স্নানে নামি

*(জার্নাল, উত্তরপঞ্চাশ)*

সঞ্জয় ভট্টাচার্যর *উর্বর উর্বশী* কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫। এলিয়ট-এর রচনার প্রতি সঞ্জয়ের একটি সহজাত অনুসরণপ্রিয়তা ছিল। 'কবি জীবনানন্দ দাশ' গ্রন্থে তিনি 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-কেই ইংরেজি কবিতার জয়স্তম্ভ বলে নির্দেশ করেছেন। যার ৪৩ বছর পরে রচিত তাঁর *উর্বর উর্বশী* কাব্য আরম্ভ হচ্ছে এইভাবে—'মাঘই কঠোরতম মাস'। আর 'দি ওয়েস্টল্যান্ড'-এর প্রারম্ভিক লাইনটি ছিল—'এপ্রিল ইজ দ্য ক্রুয়েলেস্ট মান্থ।' তবু হাজার পঙ্‌ক্তির এই আপাত-দুর্বোধ্য কাব্যটিতে কবির ধ্রুপদ স্বভাবটি হয়তো অস্বীকার করা যায় না—'মেঘলা আকাশের অন্ধকার তুমি মগ্ন-চেতনার চিত্রকর।'

এরপর সঞ্জয় ভট্টাচার্যর আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে *কথার ভেতর কথা* (২০০১) এবং *আলোছায়ার কবিতা* (২০০২)। মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা ও একটি খাতায় সংরক্ষিত অগ্রন্থিত কবিতাগুলি নিয়ে এই দুটি কাব্যেরই সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন সঞ্জয়ের অতি নিকটজন কবি-সম্পাদক ভূমেন্দ্র গুহ।

মৃত্যুচেতনা ও নিঃসঙ্গ আত্মমগ্নতায় জীবন-দেউলিয়া কবি সমকালীন ও সর্বজনীন অবহেলা এবং অবজ্ঞাকে জয় করতে চাইছিলেন অন্তর্মুখীন রহস্যময় সততার সাহায্যে। এই সৎ ও তন্নিষ্ঠ প্রয়াসই তাঁকে তখনকার জনপ্রিয় কবিদের থেকে ক্রমশ সরিয়ে দিচ্ছিল 'পূর্বাশা'-র একটি ঈর্ষণীয় ও ব্যাপ্ত লেখকগোষ্ঠী থাকা সত্ত্বেও। কারণ এই অনায়াস সুবিধা তিনি গ্রহণ করতে চান নি। নিরাশ্রয় কবি তাই 'হৃদয়ের কাছে এই নিবেদন' অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে—

বস্তুত কোথাও আর স্থান নেই, নেই কোনও দেশে
আকাশে বা অনাকাশে, রাখব-যে মন
... ... ... ...
তথাপি হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় ছিল সনির্বন্ধ অনুরোধ।

*(নিরাশ্রয়, কথার ভেতর কথা)*

তাঁকে কেউই গভীরভাবে পছন্দ করেননি। আগ বাড়িয়ে বারবার চিঠি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথকে, অনাহূত হয়ে দেখা করতে গেছেন (১৯৩৪-এ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে)। প্রত্যুত্তরে প্রায়শই পেয়েছেন পত্রের মৃদু কশাঘাত বা বক্র ঔদাসীন্য। ২৬ আগস্ট, ১৯৩৭-এ অতি ক্ষুদ্র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "সাহিত্য প্রসঙ্গে তোমার মতামত সম্বন্ধে কোনো অভিমত দিতে আমি ইচ্ছে করিনে। যদি জরুরী প্রয়োজন হয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করবো। এই সকল তর্কক্ষেত্রে প্রবেশ করতে আমার রুচি নেই।"

অথচ সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু বা বিষ্ণু দে-র ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পত্রোত্তর ছিল অনেক স্নেহপূর্ণ বা অভিপ্রেত সম্মান-সম্পন্ন। এই প্রেক্ষিতে একথার উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে রবীন্দ্রজীবনাবসানের পর যে বিপুল পরিমাণ স্মারক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৪১-এর অক্টোবরে 'পূর্বাশা'-র *রবীন্দ্রস্মৃতি সংখ্যা*-টিই মনে হয় শ্রেষ্ঠ।

১৯৫৪ সালে, মৃত্যুর কয়েকমাস আগের একটি পত্রে জীবনানন্দ দাশ লিখছেন, আপনার "*পদাবলী* পড়লাম। বেশ ভালো লাগলো; খুব মৌলিক মনে হলো; আপনার আগেকার লেখার চেয়ে এ-কবিতাগুলো একেবারে ভিন্ন।" 'বেশ ভালো লাগলো', এই উক্তিটি কিছুটা দায়সারা ভাবের ইঙ্গিতবহ। আমাদের মনে রাখতে হবে, 'দেশ' পত্রিকা একবার জীবনানন্দের কবিতা ফিরিয়ে দিয়েছিল; শুধু এই একটি কারণেই সঞ্জয় আর 'দেশ'-এ লেখেননি, পরে জীবনানন্দ লিখেছিলেন। নিজের তীব্র আর্থিক অসচ্ছলতার সময়েও প্রিয়তম কবি (জীবনানন্দ)-র জন্য অর্থের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ঘর্মাক্ত প্রচেষ্টায়।

এ বিষয়ে অবশ্য অনেকটা ব্যতিক্রম সুধীন্দ্রনাথ। প্রায়ই বলতেন, 'এ রকম নৈর্ব্যক্তিক লিরিক বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।' ১৯৫৩ সালে তিনি কবিকে লিখছেন, "*পদাবলী* পেয়ে খুব ভালো লাগলো। প্রায় প্রত্যেক কবিতাই রসোত্তীর্ণ তথা বিপুল কলাকৌশলের প্রতিমান। আপনার কাছে বাঙালী পাঠকের প্রত্যাশা বেড়েই যাচ্ছে, তাকে হতাশ করবেন না, আরও অনেক লেখা চাই।" মনে রাখতে হবে, এর পূর্বে *অপ্রেম ও প্রেম* কাব্যটি প্রকাশ পেলেও সঞ্জয়ের স্মরণীয় সৃষ্টি *উত্তরপঞ্চাশ*-এর প্রকাশ আরও দশ বছর পরে।

কবি ও সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও বিরোধিতার একটি দীর্ঘ পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি বুদ্ধদেবের বহুখ্যাত *An Acre of Green Grass* গ্রন্থে তাঁর সমকালের কবিদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার পরিসরে (*Modern Bengali Poetry*) সঞ্জয় ভট্টাচার্যর প্রতি একটি গোটা পঙ্‌ক্তিও ব্যয়িত না হতে, তাঁর জন্য বরাদ্দ হলো কয়েকটি মাত্র শব্দ—'The brooding melancholy of Sanjay Bhattacharya', তাও জীবনানন্দ দাশের russet richness-এর সাথে তুলনা প্রসঙ্গে।

বিষণ্ণ গভীর চিন্তনের কবি বলে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে চিহ্নিত করে দিয়ে সেই সময়ের কাব্যিক বিদগ্ধ সমাজ যে ধ্বংসাত্মক খেলায় মেতেছিল, সেই চক্রব্যূহ থেকে বেরোবার পথ জানা ছিল না কবির। কারণ জীবনানন্দীয় ঐশ্বরিক শিল্পদক্ষতা সকলের করায়ত্ত নয়। মনোবিকারের এই বিস্ময়ান্বিত দীর্ঘ পর্বকালটিতে যে বহুকৌণিক হীরক-বিচ্ছুরণগুলি আমরা পেয়েছি তা অনেকটাই হ্যোল্ডারলিনের শেষ ছত্রিশ বছরের উন্মাদনার ঘোরটির সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর প্রেম পরিণতি প্রাপ্ত হয়নি, নিজের সৃষ্টিকর্মকেই প্রবল অভিঘাতে আহত করে তুলেছেন। অনাগত কালের পাঠককেও তাঁর প্রগাঢ় অনুভূতি ও উপলব্ধির বৃত্তে টেনে আনতে পারেননি। সঞ্জয়ের মৌন শালীনতাবোধ ও দারিদ্র এক চিরঅপসৃয়মান কাব্যখ্যাতির সহচর হয়ে উঠেছিল। ১৯৪০-এ রচিত তাঁর *বৃত্ত* উপন্যাসটিতে এর আভাস আমরা লক্ষ্য করি।

উপন্যাসটি শেষ হচ্ছে এক দুর্লঙ্ঘ্য পরাজয়ে। চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতায় সঙ্গীহীন হতাশ মানুষের শেষ আশ্রয় কোন্‌খানে—এই অন্তহীন জিজ্ঞাসায়। বিরামহীন পথসন্ধানের পরেও সকল বাঁধন ছিন্ন হয়ে সে দাঁড়াবে কোথায়! মানব জীবনের এই আঁধার চিত্রপটটি সঞ্জয়ের

পক্ষে বহু পূর্বেই নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল তাঁর সাংঘাতিক intution-এর ফলেই। আর তাই কবিতার প্রতি সঞ্জয়ের অসীম সততা ও মুক্ত হৃদয়ের অনুলেখন আমাদের বিস্ময়ের বৃত্ত থেকে বেরোতে দেয় না। এমনই এক আত্মপ্রচারবিমুখ অন্তহীন শৈশবের কবি জীবনের উপান্ত বেলায় পৌঁছেও লিখতে পারেন—

তোমার ফ্রকের ত্বকে
গোলাপ-পাপড়ি ভাঁজে-ভাঁজে।
তুমি আছ বলে আছে প্রাচীন বাগান।
দেয়ালে শ্যাওলা ঢের, মাটি-ভরা আলুথালু ঘাস,
তবু তুমি ওখানে দাঁড়ালে
গোলাপ-পাপড়ি ঘিরে সবুজ আকাশ।

*(বালিকা-বিষয়ক, আলোছায়ার কবিতা)*

কবিতাটি ঠিক কোন্ সময়ের। সমকাল একে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আবার অনাগত সময়েও এর বিস্মৃতির বীজটি নিহিত ছিল বিশ্বাস না হারানো এক নিঃসঙ্গতায়, উপেক্ষায়, মনোবৈকল্যের অন্তরালে। শ্যাওলা-ধরা দেওয়ালের এই গারদখানাটি আমরা নিজেরাই নিয়ত নির্মাণ করে যাচ্ছি। এ বিস্মরণ বাঙালি পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে।

সঞ্জয়ের শতবর্ষে তাই অন্যধারার এক অনন্য অনুজ কবি ও সমালোচক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর মন্তব্যটির সংযোজন এখানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, "হ্যোল্ডারলিন বা সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বলয়পুষ্ট ঐকান্তিক অনুরাগী পাঠকদের এই প্রশ্ন তাই অত্যন্ত সুসংগত : ওঁরা কি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, না আমরাই, আমাদের সংকীর্ণ মনস্কতার গণ্ডির নাগরিকেরা, অনপনেয় ভূতগ্রস্ত!" (*হৃদয় সন্ন্যাসী হলো যদি*/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, *দেশ*, বইসংখ্যা ২০০৯)